আমার মীর মশাররফ

আবুল আহসান চৌধুরী

ঐতিহ্য

নিবেদন

আমার চেতনায় গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিলেন তিন কালোত্তীর্ণ সাহিত্যসাধক— একই অঞ্চলে তাঁদের আবির্ভাব— তিনজনই ছিলেন গরিব-গণবিদ্রোহের সহায়—পট উন্মোচিত হলে দেখা যাবে, এঁরা মহাত্মা লালন ফকির (১৭৭৪-১৮৯০), কাঙাল হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-১৮৯৬) ও মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১)। এই তিনজনকে নিয়েই আমি নিরলস লিখে চলেছি। 'ঐতিহ্য' থেকে ২০২৪-এ প্রকাশ পেয়েছে *আমার লালন*। এ-বছর (২০২৫) বের হবে *আমার মীর মশাররফ*। ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন না-হলে *আমার কাঙাল হরিনাথ* প্রকাশ পাবে সামনের বছর (২০২৬)।

আমার মশাররফচর্চারও পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হলো। এ-কাল যাবৎ মশাররফের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে তিনটি বই প্রকাশ পেয়েছে। মশাররফ-সংক্রান্ত অন্যান্য প্রকাশনার বিবরণ এইরকম : সম্পাদিত গ্রন্থ আটটি, নাট্যসমগ্র, অপ্রকাশিত ডায়েরি, 'হিতকরী' পত্রিকা-সংকলন, মশাররফ-বিষয়ক প্রবন্ধাবলি গ্রথন। এসব বই থেকে প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সংকলন এই *আমার মীর মশাররফ*। আশা করি এই ধ্রুপদি শিল্পীর আলেখ্য নির্মাণে এই বই খানিক সহায়ক হবে।

আমার মীর মশাররফ প্রকাশে অনেকের শ্রম, সময়, পরামর্শ ও আকাঙ্ক্ষা যুক্ত। এই অভিনব গ্রন্থ-পরিকল্পনার কৃতিত্ব 'ঐতিহ্য'র স্বত্বাধিকারী আরিফুর রহমান নাইম-এর। এই প্রতিষ্ঠান-পরিবারের মোহাম্মাদ মোসলেহ উদ্দিন, মোঃ সাইফুল ইসলাম, প্রচ্ছদশিল্পী নাওয়াজ মারজান ও অন্যদের সহযোগিতার কথাও স্মরণ করা প্রয়োজন। কবি পিয়াস মজিদের নাম আলাদাভাবে উল্লেখ করতে হয়— তিনি তুলনাহীন আন্তরিকতার সঙ্গে এই বইয়ের রচনা-বিন্যাসের কাজটি করে দিয়েছেন। এঁদের প্রতি আমার ধন্যবাদ ও শুভকামনা।

আমার দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের মশরাররফচর্চার সামান্য নিদর্শন এই বই— *আমার মীর মশাররফ*। পাঠক গ্রহণ করলে কৃতার্থ হবো।

আবুল আহসান চৌধুরী

মজমপুর, কুষ্টিয়া
ফেব্রুয়ারি ২০২৫

সূচি

প্র থ ম ভা গ
মীর মশাররফ হোসেন সমীক্ষণ

প্রথম অধ্যায়
সময়-সমাজের প্রেক্ষাপট ১৯

দ্বিতীয় অধ্যায়
মশাররফ-জীবনালেখ্য ৫৮

তৃতীয় অধ্যায়
প্রসঙ্গ সাহিত্যকর্ম ১০৪

উপন্যাস-উপাখ্যান-নকশা
রত্নবতী ১১৩
বিষাদ-সিন্ধু ১২১
উদাসীন পথিকের মনের কথা ১৪১
গাজী মিয়াঁর বস্তানী ১৬০
হজরত ইউসোফ ১৭৮
তহমিনা ১৮২
নিয়তি কি অবনতি ১৮৬

নাটক-প্রহসন
বসন্তকুমারী নাটক ১৯১
এর উপায় কি? ২১৯
বেহুলা গীতাভিনয় ২৩১
টালা অভিনয় ২৩৮
কবিতা-সংগীত-পদ্য ২৪৪
গোরাই ব্রিজ অথবা গৌরী সেতু ২৪৪
সঙ্গীত লহরী ২৪৭
মৌলুদ শরীফ ২৫২
বিবি খোদেজার বিবাহ ২৫৫
হজরত ওমরের ধর্ম্ম-জীবন লাভ ২৫৮
হজরত বেলালের জীবনী ২৬০
হজরত আমীর হামজার ধর্ম্ম-জীবন লাভ ২৬১

মদিনার গৌরব ২৬২
মোস্লেম-বীরত্ব ২৬৪
বাজীমাৎ ২৬৬

প্রবন্ধ-ইতিহাস
গো-জীবন ২৭১
এসলামের জয় ২৭৭

জীবনী-আত্মজীবনী
আমার জীবনী ২৮৩
বিবি কুলসুম ২৮৭

বিবিধ
মুসলমানের বাঙ্গলা শিক্ষা ২৯৫
ঈদের খোতবা ২৯৭
উপদেশ ২৯৮
সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা ২৯৯
আজীজন নেহার ৩০০
হিতকরী ৩০৪

চতুর্থ অধ্যায়
সামাজিক চিন্তা-চেতনার স্বরূপ ৩২৩

পঞ্চম অধ্যায়
উপসংহার ৩৭৩

পরিশিষ্ট
মশাররফের গ্রন্থ ও রচনাপঞ্জি ৩৭৮

দ্বি তী য় ভা গ
মশাররফ প্রসঙ্গে আরো কিছু

মীর মশাররফ হোসেন : বাঙালিত্ব ও মাতৃভাষাপ্রীতি ৪০১
মীর মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত ডায়েরি প্রসঙ্গে ৪০৭
তিন পাগলের মেলা : লালন-কাঙাল-মশাররফ ৪১৮

তৃ তী য় ভা গ
মীর মশাররফ হোসেন-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-পরিচিতি ৪৩৭

প্র থ ম ভা গ

মীর মশাররফ হোসেন সমীক্ষণ

প্রস্তাবনা

মীর মশাররফ হোসেন উনিশ শতকের একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক। মুসলিম সমাজের প্রতিনিধিত্বহীন, হিন্দু-প্রভাবিত বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা একটি বিস্ময়কর ঘটনা। দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রতিভার গুণেই তিনি সমকালীন পাঠক ও সমালোচকের সপ্রশংস মনোযোগ আকর্ষণে সক্ষম হন। তাঁর জীবনবৃত্ত ও সাহিত্যকর্মের পঠন-পাঠন-আলোচনা-বিশ্লেষণ নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম প্রয়াসের সার্থক সূচনা তাঁকে দিয়েই। সব্যসাচী শিল্পী-ব্যক্তিত্ব মশাররফ ছিলেন নব্য-উত্থিত মুসলিম মধ্যশ্রেণীর সাংস্কৃতিক মুখপাত্র। তাঁর জীবন ও সাহিত্য উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানের জীবন-ভাবনা, মনন-মানস ও চিন্তা-চেতনার সঙ্গে দ্বন্দ্ব-সংহতির সূত্রে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। তাঁর রচনার বিষয়-বৈচিত্র্য, প্রকাশ-নৈপুণ্য, সমাজ-মনস্কতা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও অকপট স্বীকারোক্তি তাঁকে শিল্পী হিসেবে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তিনিই প্রথম সাহিত্যসেবী যাঁর প্রয়াসের মাধ্যমে বাংলার শিল্প-সংস্কৃতিচর্চার মূলধারার সঙ্গে মুসলিম সমাজের যোগসূত্র রচিত হয়।

সাহিত্যক্ষেত্রে মশাররফের আবির্ভাবে সমকালীন প্রতিক্রিয়া যথেষ্টই তীব্র হয়েছিল। অসামান্য স্বীকৃতি ও সমাদরপ্রাপ্তির পাশাপাশি নিন্দিত-সমালোচিতও হন তিনি। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যে-পরিমাণ মনোযোগ, সম্মান ও প্রশংসা তিনি হিন্দুসমাজের নিকট থেকে লাভ করেন, দুর্ভাগ্যের বিষয়, প্রায় সম-পরিমাণ অবহেলা, অনাদর ও উপেক্ষা অর্জন করেন স্ব-সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন'-সহ হিন্দু পরিচালিত উল্লেখযোগ্য প্রায় সব পত্র-পত্রিকায় মশাররফের শিল্পকর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর আবির্ভাব অভিনন্দিত হয়। 'ক্যালকাটা রিভিউ' (১৮৭০) পত্রিকায় প্রকাশিত মশাররফের প্রথম গ্রন্থ 'রত্নবতী'র (১৮৬৯) পরিচিতি থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত একশ বছরেরও অধিককাল ধরে মশাররফ-সম্পর্কিত আলোচনার ধারা প্রবহমান। এই লঘু-গুরু মূল্যায়নের চুম্বক-ধারণা গ্রহণ

মশাররফচর্চার গতি-প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য বিশেষ জরুরি ও প্রয়োজনীয়।

এ-যাবৎ মশাররফের জীবনী-সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তিনটি : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণকুমারী দেবী, মীর মশাররফ হোসেন' (কলিকাতা, ১৩৫৫), আবদুল লতিফ চৌধুরীর 'মীর মশাররফ হোসেন' (সিলেট, ১৯৫২) ও মোহাম্মদ আবদুল আউয়ালের 'মীর মশাররফ হোসেন' (ঢাকা, ১৯৭১)। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রবন্ধের কথাও বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়, যেমন : আশরাফ সিদ্দিকীর 'মীর মশাররফ হোসেন' (বাঙ্লা একাডেমী পত্রিকা', পৌষ ১৩৬৩), এস. এম. আবদুল লতিফের 'মীর মশাররফ হোসেনের জীবন-কথা' (সাহিত্যিকী', ১৫-১৬ বর্ষ ১৩৮৫-৮৬, শরৎ-বসন্ত সংখ্যা), অপ্রকাশিত তথ্যোপকরণের সাহায্যে লিখিত শামসুজ্জামান খানের দুটি প্রবন্ধ 'স্ত্রী ও পত্রিকার একই নাম—আজিজানাহার' ('সচিত্র সন্ধানী' ৫ ফাল্গুন ১৩৮৫) ও 'মীর মশাররফ হোসেন : জীবনকথা—কিছু নতুন তথ্য' ('দৈনিক সংবাদ', ১০ পৌষ ১৩৯৯)। মশাররফের জীবনী-সংক্রান্ত রচনার মধ্যে ব্রজেন্দ্রনাথের পুস্তিকাটি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। তথ্য-সমৃদ্ধ ও সংহত এই জীবনীটি মশাররফ-সম্পর্কিত পরবর্তী সব রচনাকেই প্রভাবিত করেছে। বলা চলে, ব্রজেন্দ্রনাথের এই চরিত্র-পুস্তিকাই অন্যদের মশাররফ-সংক্রান্ত রচনার মূল উৎস। এই পুস্তিকাটি যেহেতু 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র নির্দিষ্ট কাঠামোর অধীনে রচিত, লেখকের জীবন ও সাহিত্য-সম্পৃক্ত তথ্য-পরিবেশনই মূল লক্ষ্য, তাই শিল্পীর মনন-মানস ও তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি অবিশ্লেষিত থেকে গেছে। আবদুল লতিফ চৌধুরীর পুস্তিকায় মীরের দু-একটি গ্রন্থের পরিচিতি-প্রসঙ্গ ব্যতীত নতুন তথ্য বা বিশ্লেষণ অনুপস্থিত। সেই তুলনায় আবদুল আউয়াল প্রণীত জীবনীটি সুলিখিত, সমাজ-পটভূমিকে বিবেচনায় এনে তিনি মশাররফ-সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নে ব্রতী হয়েছেন। পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত উপরি-বর্ণিত প্রথম দুটি প্রবন্ধ ব্রজেন্দ্রনাথের পুস্তিকা এবং মশাররফের 'আমার জীবনী', 'বিবি কুলসুম' প্রভৃতি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের সাহায্যে রচিত। এইসব প্রবন্ধে নতুন তথ্য কখনো কেউ কেউ দিয়েছেন, যেমন আশরাফ সিদ্দিকী, কিন্তু সূত্রবিহীন হওয়ায় সেই তথ্যের প্রামাণিকতা সম্পর্কে সংশয় থেকে গেছে। শামসুজ্জামান খানের প্রবন্ধ মীরের জীবনীর উপরে নতুন আলোক নিক্ষেপ করেছে।

মুনীর চৌধুরীর 'মীর-মানস' (ঢাকা, ১৯৬৫) মশাররফ হোসেন সম্পর্কে প্রকাশিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। মশাররফের শিল্পসৃষ্টিতে প্রতিফলিত তাঁর চিন্তা-চেতনার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করে মশাররফের মনন-মানসের পরিচয়-দানের

লক্ষ্যে এই গ্রন্থের প্রবর্তনা। আধুনিক শিল্প-দৃষ্টির প্রক্ষেপে এবং প্রয়োজনে তুলনামূলক রীতির অনুসরণে মশাররফ-সাহিত্যের বিশ্লেষণ প্রচেষ্টায় 'মীর-মানস' গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস হিসেবে বিবেচিত। তবে মশাররফের এই সৃষ্টি-সমীক্ষাও সম্পূর্ণ নয়। মুনীর চৌধুরীর দৃষ্টি কেবল মশাররফের উল্লেখযোগ্য গদ্যশিল্পের উপরেই নিবদ্ধ ছিলো,—অপ্রধান ও ধর্মাশ্রিত রচনা কিংবা পদ্যগ্রন্থ তাঁর যথার্থ অভিনিবেশ পায়নি।

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল মশাররফ সম্পর্কে গবেষণা করে প্রথম পি-এইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। 'মীর মশাররফের গদ্যরচনা' (ঢাকা, ১৩৮২) গ্রন্থটি মূলত তাঁর পি-এইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ 'The Prose Works of Mir Massarraf Hosen' (Chittagong, 1975)-এর তর্জমা। এখানে তিনি মশাররফের গুরুত্বপূর্ণ গদ্যরচনার (১৮৬৯-১৮৯৯) শৈল্পিক গুণাগুণ বিচার করেছেন। প্রসঙ্গত যুগ-পরিবেশ, তাঁর মনন-মানসও এই আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'মীর-মানসে'র মতো এই গ্রন্থেও লেখক মশাররফের গৌণ গদ্যরচনার প্রতি মনোযোগ দেননি। অবশ্য গবেষণার বিষয়গত সীমাবদ্ধতার কারণে মশাররফের সমগ্র শিল্প-পরিচয় প্রদানের সুযোগও এখানে অনুপস্থিত। 'ভাষাশিল্পী মশাররফ' (ঢাকা, ১৯৬৯) গ্রন্থে তিনি মশাররফের ভাষাশৈলী সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করেছেন।

বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে মশাররফ হোসেন যথাযথ গুরুত্ব-অনুসারে আলোচিত হয়েছেন এ-কথা বলা চলে না। তবুও এর মধ্যে মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসানের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে' (আধুনিক যুগ, ঢাকা, ১৯৫৬) মশাররফ-প্রসঙ্গে আবদুল হাইয়ের আলোচনাংশটুকু গুরুত্বপূর্ণ। ভূদেব চৌধুরী তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা'য় (২য় পর্যায়, চ-স : কলিকাতা, ১৩৮০) মশাররফের সাহিত্যকর্ম নিয়ে প্রণিধানযোগ্য আলোচনা করেছেন। আজহার ইসলামের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ' (আধুনিক যুগ, ঢাকা, ১৩৭৬) গ্রন্থেও প্রচলিত তথ্যের সাহায্যে মশাররফের পরিচিতি প্রদান করা হয়েছে।

মুসলিম-মানসের পরিচয়-সূত্রে সামাজিক প্রেক্ষাপট অবলম্বন করে কাজী আবদুল মান্নান তাঁর 'আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা (রাজশাহী, ১৯৬১) ও আনিসুজ্জামান তাঁর 'মুসলিম মানস ও বাংলাসাহিত্য' (ঢাকা, ১৩৭১) গ্রন্থে প্রসঙ্গক্রমে মশাররফ হোসেন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তথ্যের দিক থেকে কাজী আবদুল মান্নান ও বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে আনিসুজ্জামানের আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। ওয়াকিল আহমদও তাঁর

'উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা' (১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৩৯০) গ্রন্থে কিছু নতুন তথ্যসহ প্রসঙ্গত মশাররফ হোসেন সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন।

মোহাম্মদ আবদুল কাইউম 'রত্নবতী থেকে অগ্নিবীণা—সমকালের দর্পণে' (ঢাকা, ১৩৯৮) গ্রন্থে সমকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মশাররফের বিভিন্ন গ্রন্থের সমালোচনা সংগ্রহ ও সংকলন করেছেন। তাঁর 'সাময়িক পত্রে সাহিত্যিক-প্রসঙ্গে' (ঢাকা, ১৩৯৭) গ্রন্থে অধুনা দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মশাররফ-সম্পর্কিত সংবাদ ও তর্ক-বিতর্ক সংকলন করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সহজলভ্য করে দিয়েছেন। আলী আহমদ তাঁর 'বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী'তে (ঢাকা, ১৩৯২) মশাররফের গ্রন্থাবলির বিস্তৃত প্রকাশনা তথ্য উদ্ধার করে, অপ্রকাশিত রচনার হদিস দিয়ে এবং মশাররফ-সম্পর্কিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের উল্লেখ করে অনুসন্ধিৎসু পাঠক-গবেষককে উপকৃত করেছেন।

মোহাম্মদ ইদরিস আলী মশাররফের 'বাজীমাত' ('বাংলা একাডেমী পত্রিকা', ভাদ্র-চৈত্র ১৩৬৫), 'হজরত বেলালের জীবনী' ('বরেন্দ্র সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা', ১৩৬৭) 'মদীনার গৌরব' ('বাংলা একাডেমী পত্রিকা', মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮), 'হজরত আমীর হামজার ধর্ম্মজীবন লাভ' ('সাহিত্য পত্রিকা', বর্ষা ১৩৬৯), 'মৌলুদ শরীফ' ('বাংলা একাডেমী পত্রিকা', মাঘ-চৈত্র ১৩৬৯), 'মোসলেম বীরত্ব' ('বাংলা একাডেমী পত্রিকা', কার্তিক-পৌষ ১৩৭২) প্রভৃতি গ্রন্থের পরিচিতিমূলক আলোচনার মাধ্যমে এইসব দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। নানা প্রবন্ধ রচনা করে মশাররফের জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আর যাঁরা আলোকপাত করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সৈয়দ মুর্তাজা আলী, মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, সুকুমার মিত্র, আহমদ রফিক, এ. কে. এম. আমিনুল ইসলাম, আজহারউদ্দীন খান, ক্ষেত্র গুপ্ত প্রমুখ।

মশাররফের স্মরণীয় শিল্পকর্ম 'বিষাদ-সিন্ধু' সম্পর্কে আলোচনা করে তাঁর শিল্প-প্রতিভার পরিচয় উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস পেয়েছেন কাজী আবদুল ওদুদ (শাশ্বত বঙ্গ, কলিকাতা, ১৩৫৮), মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ('মুসলিম বাংলা সাহিত্য', ঢাকা, ১৩৭৫), আবু হেনা মোস্তফা কামাল ('কথা ও কবিতা', ঢাকা, ১৯৮১) ও অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় (বাংলা একাডেমী পত্রিকা, কার্তিক-চৈত্র ১৩৯৩)। এরমধ্যে আবদুল ওদুদের আলোচনাটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে 'বিষাদ-সিন্ধু' অবলম্বনে মশাররফের শিল্পী-মানসের মৌল প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্যকে তিনি নির্দেশ করেছেন। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ও আবু হেনা মোস্তফা কামাল শিল্পরূপকে তাঁদের আলোচনায়

প্রাধান্য দিয়েছেন। ‘বিষাদ-সিন্ধু’র গঠনরীতি ও ভাষাশৈলী বিবেচনা লাভ করেছে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের রচনায়।

‘বিষাদ-সিন্ধু’ ব্যতীত দীর্ঘকাল মশাররফ হোসেনের অন্যান্য গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য ছিল। পাকিস্তান-কালপর্বে একাডেমিক পঠন-পাঠন, আলোচনা-গবেষণা ও পাঠক-চাহিদার প্রয়োজনে মশাররফের কিছু কিছু গ্রন্থের সম্পাদিত সংস্করণ প্রকাশিত হতে থাকে। সম্পাদকীয় ভূমিকা এইসব বইয়ের বিস্তৃত পরিচয় উদ্ধারে সাহায্য করে। আশরাফ সিদ্দিকী এই উদ্যোগের পথিকৃৎ। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ‘জমীদার দর্পণ’ (১৯৫৫) ও ‘গাজী মিয়াঁর বস্তানী’ (১৯৬০)। মোহাম্মদ আবদুল আউয়ালের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ‘রত্নবতী’ (১৯৬৯), ‘বসন্তকুমারী’ (১৩৭৬) ও ‘জমীদার দর্পণ’ (১৯৮৯)। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সম্পাদনা করেন ‘গো-জীবন’ (১৩৭৫)। ‘উদাসীন পথিকের মনের কথা’ (১৩৭৭) গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় এ. কে. এম. শামসুল ইসলামের সম্পাদনায়। আনিসুজ্জামান সংগ্রহ ও সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন ‘এর উপায় কি?’ (১৩৮১)। আবুল আহসান চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ‘সঙ্গীত লহরী’ (১৯৭৬), ‘টালা অভিনয়’ (১৯৭৯) ও ‘মুসলমানের বাঙ্গলা শিক্ষা’ (১৯৮১)। ‘আমার জীবনী’ (১৩৮৪) প্রকাশিত হয় দেবীপদ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায়। সৈয়দ আলী আহসানের সম্পাদনায় প্রকাশ পায় ‘গাজী মিয়াঁর বস্তানী’ (১৩৮৯)। কলিকাতার হরফ প্রকাশনী থেকে ‘বিষাদ-সিন্ধু’ ও ‘জমীদার দর্পণ’ বই দুটি একত্রে ‘বিষাদ সিন্ধু’ (১৯৭৩) নামে প্রকাশিত হয় আবদুল আজিজ আল-আমানের সম্পাদনায়। কলিকাতার কমলা সাহিত্য ভবনের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় ‘মীর মশাররফ হোসেন রচনাসংগ্রহ’ (১ম খণ্ড, ১৩৮৫)। এই রচনাসংগ্রহ সম্পাদনা করেন বিষ্ণু বসু ও ভূমিকা রচনা করেন অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। কাজী আবদুল মান্নানের সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী পাঁচ খণ্ডে প্রকাশ করে ‘মশাররফ রচনা-সম্ভার’ (১৩৮৩, ১৩৮৬, ১৩৯১, ১৩৯১, ১৩৯২)। যদিও এই পাঁচ খণ্ডে মশাররফের সব প্রকাশিত গ্রন্থই অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তাঁর অপ্রকাশিত রচনা-ডায়েরি-চিঠিপত্রও অসংযোজিত থেকে গেছে, তবু এই অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় কাজ এবং তা মশাররফচর্চার ক্ষেত্রকে সহজ, আয়াসমুক্ত ও প্রসারিত করেছে।

মশাররফচর্চার এই খতিয়ান নিঃসন্দেহে একজন মহৎ ও ধ্রুপদী সাহিত্যশিল্পীর প্রতি সানুরাগ মনোযোগের স্বাক্ষর। কিন্তু এ-কথাও বলতে হয়, মশাররফ-সম্পর্কিত গবেষণাকাজ সংখ্যার বিচারে উল্লেখযোগ্য হলেও গুণগত বিচারে আশানুরূপ নয়। এর মূলে আছে কিছু বিশেষ মানস প্রবণতা, তথ্যগত সীমাবদ্ধতা ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমালোচনা-সামর্থ্যের অভাব।

ব্রজেন্দ্রনাথের তথ্যের প্রতি অসহায় নির্ভরতা ও নির্বিচার ব্যবহার পুনর্বিবেচনার সুযোগকে সংকুচিত করেছে। ফলে পরবর্তীকালের মশাররফের জীবন ও সাহিত্য-সম্পর্কিত আলোচনায় কোনো নতুন মাত্রা যুক্ত হয়নি। পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিতপূর্বে ও পরে মশাররফচর্চায় এক ধরনের ধর্মীয় চেতনা ও জাতিগত গৌরববোধ ছায়া ফেলে। অপরপক্ষে পশ্চিমবঙ্গে, সামান্য ব্যতিক্রম ব্যতীত, মশাররফ প্রত্যাশিত গুরুত্ব ও মনোযোগ লাভ করেননি।

উল্লিখিত সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন থেকেই বর্তমান বইয়ের পরিকল্পনা। বস্তুত মশাররফ হোসেনের অপ্রকাশিত আত্মজীবনী, অন্যান্য রচনার পাণ্ডুলিপি, দিনপঞ্জিকা, চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কাগজপত্র, হিসাবপত্রের খাতা, বিবি কুলসুমের ডায়েরি, 'হিতকরী' পত্রিকা, নীলবিদ্রোহ-সংক্রান্ত মোকদ্দমার নথি এবং পূর্বে অব্যবহৃত দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মশাররফের গ্রন্থ সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক ও নানা টুকরো খবর ইত্যাদি আকর তথ্য-দলিল ব্যবহারের সুযোগ এই অভিসন্দর্ভ রচনাকালে পাওয়া গেছে। ফলে মীরের জীবনী-পুনর্গঠন এবং তাঁর সাহিত্য-সম্পর্কিত পূর্ববর্তী ধারণা ও সিদ্ধান্ত অনেকক্ষেত্রেই পুনর্বিবেচনার সুযোগ মিলেছে।

প্রথম অধ্যায়

সময়-সমাজের প্রেক্ষাপট

বৃটিশ শাসন-প্রতিষ্ঠার সূত্রে বাংলা ও ভারতের আর্থ-সামাজিক জীবনে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয়। ভারত-সমাজে যুগান্তকারী এই সামাজিক বিপ্লব সংঘটনে "ইংল্যাণ্ড ছিল ইতিহাসের অচেতন অস্ত্র"।[১] এর ফলে দেশীয় কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংস হয়, রোপিত হয় পুঁজিবাদী শিল্পের বীজ, নতুন ভূমি-ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হয় সমাজ-কাঠামো, ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের দরজা উন্মুক্ত হয়, জন্ম নেয় নতুন শ্রেণি ও সমাজ। সমাজ-কাঠামোর এই উত্থান-পতন ও রূপান্তরে ভারতকে একদিকে চরম মূল্য দিতে হয়, অন্যদিকে ধ্বংস-স্তূপের অভ্যন্তরে জীবন— অঙ্কুরোদ্‌গমের মতো ভারত এক সম্ভাবনাময় নতুন যুগে উত্তীর্ণ হয়।

অর্থনৈতিক অবস্থা

কার্ল মার্কস (১৮১৮—১৮৮৩) 'হিন্দুস্তানের স্বর্ণযুগে' বিশ্বাসী ছিলেন না, তবু তিনি ব্রিটিশ-শোষণের স্বরূপ লক্ষ্য করে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন যে :

> ...বৃটিশেরা হিন্দুস্তানের উপর যে দুর্দশা চাপিয়েছে তা হিন্দুস্তানের আগের সমস্ত দুর্দশার চাইতে মূলগতভাবে পৃথক এবং অনেক বেশি তীব্র।[২]

প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ শোষণ ও লুণ্ঠন যে-কেবল সরকারি নীতি বা আইনের আওতাতেই হতো তা নয়, ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্যের নামে এবং দুর্নীতি-উৎকোচের মাধ্যমেও হতো। পলাশি-যুদ্ধের পর কোম্পানি ও কোম্পানির কর্মচারীবৃন্দ দেশের মোট রাজস্বের শতকরা ৬৬ ভাগ করায়ত্ত করেন।[৩] সংগৃহীত রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশেরও অধিক পরিমাণ অর্থ ব্রিটেনে চলে যায়।[৪] ১৮০৭ সালের হিসাব অনুসারে জানা যায়, পূর্ববর্তী ত্রিশ বছরে ১০৮৫

কোটি টাকা ব্রিটেনে পাচার হয়।[৫] এর ফলে সংগত কারণেই দেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

দেওয়ানি লাভের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ও তার কর্মচারিদের অবাধ শোষণ ও লুণ্ঠন এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য নির্মম অত্যাচারের ফলে ১৭৬৯-৭০ সালে (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) বাংলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত এই মহাদুর্ভিক্ষে বঙ্গদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ প্রাণ হারায়।[৬] কিন্তু কোম্পানির জুলুম-অত্যাচার এই মর্মন্তুদ মানবিক বিপর্যয়ের পরও হ্রাস পায়নি, দুর্ভিক্ষের পরবর্তী বছরে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় অধিক খাজনা আদায় হয়।[৭] ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রতিক্রিয়ায় দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষির মারাত্মক ক্ষতি হয়। এই মন্বন্তর মধ্য ও নিম্নবিত্তের মানুষকেই শুধু নিঃস্ব ও নিশ্চিহ্ন করেনি, সামন্ত ও উচ্চবিত্তের অভিজাত শ্রেণিকেও বিপর্যস্ত করেছিল।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরিপ্রেক্ষিতে রাজস্ব সংগ্রহের আরো সুষ্ঠু ও নিশ্চিত পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্য বঙ্গদেশে প্রথমে 'পাঁচসালা', পরে 'দশসালা' এবং সবশেষে ১৭৯৩ সালে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তিত হয়। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার আর্থ-সামাজিক জীবনে সুগভীর ও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। এরফলে যুগ যুগ ধরে প্রচলিত এদেশের ভূমি-ব্যবস্থার রূপ ও রীতির মৌল পরিবর্তন ঘটে। রাজস্ব আদায়ের চুক্তিতে জমিদার জমিতে লাভ করলো বংশানুক্রমিক দখলিস্বত্ব। বঙ্গদেশে জমিদারের পক্ষ থেকে সরকারকে দেয় মোট রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট হয়েছিল চার কোটি দুই লক্ষ টাকা। কিন্তু বন্দোবস্তের প্রথম বছরেই জমিদারগোষ্ঠী কৃষক-প্রজার নিকট থেকে এর প্রায় তিনগুণ খাজনা ও কর আদায়ে সক্ষম হয়। রাজস্ব আদায়ের নামে জমিদারশ্রেণীর পীড়ন ও অত্যাচার ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৮] এর উপরে মধ্যস্বত্বভোগীর জুলুমের কারণে কৃষকসমাজকে নিঃস্ব ও ভূমিহীন হতে খুব বেশি সময় লাগেনি।[৯] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল ও প্রতিক্রিয়ার প্রকৃত রূপটি ছিল এইরকম :

> কর্নওয়ালিসের আইন কেবল কৃষকদের প্রাক্তন ভূমিস্বত্বই উৎখাত করেনি, কৃষকদের জমিচাষে উন্নততর পদ্ধতি প্রবর্তনও প্রহত করেছিল, কারণ জমির উন্নতিতে ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধি পেত। এভাবে বাংলায় কৃষির মারাত্মক অবনতি ঘটে এবং এখানকার কৃষকরা সারা ভারতের মধ্যে দরিদ্রতম অবস্থায় পৌঁছায়।[১০]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার আটজন প্রধান জমিদার, যাঁরা বাংলার মোট রাজস্বের অর্ধেক প্রদান করতেন, তাঁরা দুর্বল ও নিঃস্ব হয়ে পড়েন। ক্রমে

জমিদারির হাতবদল হয়।[১১] ছোটো-বড়ো বহু নব্য-জমিদারির সৃষ্টি হয়। এই ভূ-সম্পত্তির মালিক হন ইংরেজের অনুগ্রহভাজন মুৎসুদ্দি-বেনিয়ান-দালাল-গোমস্তা ফড়িয়ার দল, যাঁদের হাতে অগাধ অর্থ-সম্পদ সঞ্চিত হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকদের চাহিদা ও প্রত্যাশা অনুযায়ী এইভাবে শোষণ-সহায়ক এক অনুগত শ্রেণি জন্ম নিল। এ-কথা সত্য যে:

> চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের গোত্রান্তরিত করেছিল। পূর্বের ফিউডাল বদান্যতা এই হঠাৎ-জমিদারদের ছিলনা। তাঁরা স্বার্থপর অর্থপিশাচ হৃদয়হীন ঠিকাদারে পরিণত হয়েছিলেন—ইংরেজদের রাজস্বের ঠিকাদার।[১২]

এই নব্য সামন্তশ্রেণী কৃষক-শোষণের মাধ্যমে যে অর্থ-সংগ্রহ করতেন তা ব্যয় হতো ভোগ-বিলাস, দান-সেবা, পাল-পার্বণ-উৎসবের মতো ইন্দ্রিয়-সুখ, পুণ্য সঞ্চয়, আভিজাত্য-প্রদর্শন ও খ্যাতি অর্জনের অনুৎপাদনশীল খাতে। অথচ এই অর্থে বাংলায় শিল্প-পুঁজির বিকাশের সুবর্ণ সুযোগ সৃষ্টি হতে পারতো, যেমন করে ভারত-লুণ্ঠনের অর্থে ইংল্যান্ডের শিল্প-বিপ্লব ত্বরান্বিত হতে পেরেছিল।[১৩]

১৮৩৩ সালে ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের সম্পূর্ণ অবসান ঘটে। এই সময় থেকে শোষণ-পদ্ধতিরও পরিবর্তন সাধিত হয়। শোষণের এই 'আধুনিক পর্বে' বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এক সূক্ষ্ম ও দূরপ্রসারী শোষণ-প্রক্রিয়া চালু হয় এইভাবে :

> ইংলণ্ডের শিল্পপতিদের স্বার্থে ভারতের অর্থনৈতিক মর্মমূলে আরও গভীরভাবে প্রবেশের জন্যে রেলপথ প্রতিষ্ঠা, পথ-ঘাটের উন্নতি, কোম্পানির আমলে যে সেচব্যবস্থা সম্পূর্ণ অবহেলিত ছিল তারও প্রতি মনোযোগ প্রদানের সূচনা, ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ ও সর্বত্র একই ধরনের ডাকব্যবস্থার প্রবর্তন, কেরানী ও অনুগত ভৃত্য যোগাড় করবার জন্যে ইংরেজি-শিক্ষার সীমাবদ্ধ প্রথম সূচনা, ইউরোপীয় ব্যাংক-ব্যবস্থার প্রচলন—ইত্যাদি অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়ে পড়ে।[১৪]

এর পাশাপাশি ব্রিটেনের শিল্পপতিরা তাদের গভীরতর স্বার্থে পণ্যের প্রসারিত বাজারের প্রয়োজনে এদেশের আর্থিক জীবনে বিপর্যস্ত জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আর্থিক সম্পদ সৃষ্টির প্রয়াস পায়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা ইংল্যাণ্ডের শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপন্নের উদ্যোগ গ্রহণ করে।[১৫] এই উদ্যোগের সঙ্গে মুখ্যত নীলচাষ এবং চা-কফি-রবার চাষের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। নীলচাষ বাংলার অর্থনীতি ও

সমাজজীবনে গভীর প্রভাব ফেলে। অধিক মুনাফার লোভে নীলচাষের নামে কৃষকের উপর ইংরেজ নীলকরের অমানুষিক পীড়ন-অত্যাচার কৃষক-প্রজার জীবন দুর্বিষহ ও অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলেছিল। বাংলায় নীলবিদ্রোহ ছিল এরই অনিবার্য পরিণতি।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানির শাসনের অবসান হয় এবং ১৮৫৮ সালে ভারত শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন বৃটিশরাজ। এই নতুন ব্যবস্থায় ভারত-শোষণ অনেকাংশে শাসনতান্ত্রিক ভদ্ররূপ লাভ করে। বৃটিশ শিল্প-পুঁজির সহায়তায় এইসময় থেকে বিভিন্ন শিল্প-কলকারখানা ব্যাপকভাবে গড়ে উঠতে থাকে। এর পাশাপাশি সীমিত ক্ষেত্রে দেশীয় পুঁজির বিকাশের সুযোগও উন্মোচিত হয়।[১৬]

প্রকৃতপক্ষে ভারতে শিল্পায়ন কিংবা দেশীয় পুঁজিতন্ত্রের বিকাশে ইংরেজের সহায়তা ছিল তার নিজেরই শিল্প-বাণিজ্যের স্বার্থে। তবে এর আর্থ-রাজনীতিক ফলাফল হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। যতই অসম ও দুর্বল হোক, তবুও এই প্রথম দীর্ঘ ইংরেজ শাসন-পর্বে ভারতীয়রা অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হলো, জাতীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। দেশীয় শিল্প-পুঁজির বিকাশের ফলে নতুন সামাজিক শক্তি ও শ্রেণির উদ্ভব হলো, যা উত্তরকালে জাতীয় চেতনা স্ফুরণের প্রধান সহায় হয়েছিল।

২

ইংরেজ-আমলে বাংলার বিপর্যস্ত অর্থনীতির ক্ষতির মাশুল সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায়কেও গুণতে হয়। তবে প্রকৃতিগতভাবে তা প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায় থেকে অনেকাংশে ভিন্ন রকমের ছিল। এতে মুসলমান সমাজকে জাতীয় জীবনের পথযাত্রায় হিন্দু সম্প্রদায় থেকে পিছিয়ে পড়তে হয়।

ব্রিটিশ শাসন-পূর্বকালের মুসলমান সমাজকে সাধারণভাবে তিন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা চলে : ক. অভিজাত শাসকগোষ্ঠী, খ. শাসন-সহায়ক শক্তি: জমিদার-জোতদার, সরকারি আমলা-কর্মচারী ইত্যাদি, এবং গ. বৃত্তিজীবী গ্রামীণ মানুষ : কৃষক-দিনমজুর, জেলে-জোলা, মাঝি-মাল্লা ইত্যাদি।[১৭] ইংরেজ শাসনের অভিঘাতে এই তিনটি শ্রেণিই ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

ইংরেজের নীতি ও পদক্ষেপের কারণে মুসলিম অভিজাতশ্রেণির পতন ও বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। উইলিয়াম হান্টার উল্লেখ করেছেন :